২৬/৫/২০০৩

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইত্তেফাক

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ

আমরা উদ্বিগ্ন। একদা এই রাজধানীর বুকেই চৌদ্দ বছরের স্কুল-ছাত্রী সানজিদা হক শান্তা সংশ্লিষ্ট স্কুলের পিটি শিক্ষিকার অর্বাচীনতা ও নিষ্ঠুরতার কারণে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। ইহা খুব বেশীদিন আগের ঘটনা নয়। সে ঘটনার পর আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছিলাম, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছিলাম শিক্ষার্থীদের প্রতি সব ধরনের নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করিতে। কিন্তু আমাদের সে আহ্বানে সাড়া দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিলেন না বাগেরহাট জেলার শরণখোলার নলবুনিয়া রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তিনি গত ২রা আগষ্ট চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র বাপ্পীকে পড়া না পারার কারণে স্রেফ পিটাইয়া আধমরা করিয়া ফেলেন। বাপ্পীকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করাইতে হয়। আর এই দুঃখজনক খবরটি প্রকাশিত হয় ইত্তেফাকে গত বৃহস্পতিবার।

মনে রাখিতে হইবে, সংবাদপত্রে সব ঘটনা প্রকাশিত হয় না। শান্তার মৃত্যু না ঘটিলে হয়তবা আমরা উক্ত পিটি শিক্ষিকার নিষ্ঠুরতার কথা জানিতেই পারিতাম না। বাপ্পীর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নিষ্ঠুরতার খবরও আমরা হয়তবা পাইতাম না যদি বাপ্পীর মাতা জেসমিন আক্তার সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা না-করিতেন। উদ্বেগের বিষয় ইহাই। শান্তা ও বাপ্পীর ঘটনা যদি বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা হইত তবে আতংকিত হইবার কিছু ছিল না। কিন্তু ঘটনা দুইটি বিচ্ছিন্ন নয়। এই ধরনের ঘটনা প্রায় প্রতিনিয়তই ঘটিতেছে বলিয়া বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিষ্ঠুরতার কথা আমরা যেমন ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রায় নিয়মিত শুনিতে পাই তেমনি পাঠকদের নিকট হইতেও আমরা এ সংক্রান্ত চিঠিপত্র পাইয়া থাকি। এসব ঘটনা সংবাদপত্রে সাধারণত স্থান পায় না। কারণ এইসব ক্ষেত্রে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা একশ্রেণীর শিক্ষক-শিক্ষিকার নিষ্ঠুরতার শিকার হইলেও শান্তার মত মৃত্যুবরণ করে না বা ইহা লইয়া কোন মামলা-মোকদ্দমা হয় না।

অন্যায় করিলে, ভুল করিলে বা পড়াশোনায় অমনোযোগী হইলে অভিভাবকদের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকারাও শিক্ষার্থীদের সহনীয় মাত্রায় শাস্তি দিতে পারেন। আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই অধিকার স্বীকৃত। আমাদের সমাজে এখনও এই কথা বিশ্বাস করা হয় যে, মা-বাবা যেমন সন্তানের মঙ্গলের জন্যই প্রয়োজনে শাস্তি দিয়া থাকেন তেমনি শিক্ষক-শিক্ষিকারাও শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর কল্যাণের জন্যও মাঝে মাঝে শাস্তি দেন বা দিতে পারেন। কিন্তু বাপ্পীর মত একটি শিশুকে যে শাস্তি দেওয়া হইল তাহা মানিয়া নেওয়া যাইতে পারে কীভাবে? একথা কোন পাগলেও বিশ্বাস করিবে না যে, 'মঙ্গলের' জন্যই বাপ্পীকে তাহার শিক্ষক পিটাইয়া অজ্ঞান করিয়া হাসপাতালে পাঠাইয়াছেন। আমাদের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, বাপ্পীর মাতা উক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা করিয়াছেন। অর্থাৎ বাপ্পীর মাতা ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক বলিয়া মনে করেন নাই, কেহ তাহা মনে করিবেও না।

আমরা বলি না যে, সকল স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সীমা লংঘন করা হয় বা সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা এই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মটি করেন। তবে দেখিয়া-শুনিয়া মনে হইতেছে, এক্ষেত্রে পরিস্থিতির কোন উন্নতি ঘটিতেছে না। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিষ্ঠুরতার খবর আমাদের শুনিতে হইতেছে। আমরা আর এ ধরনের অভিযোগ শুনিতে চাই না। আমরা মনে করি, এমন মাত্রায় শাস্তি কোন শিক্ষার্থীকে দেওয়া উচিত নহে যাহা দেখিয়া মনে হইবে যে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাইয়া ফেলার 'রোগে' যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা আক্রান্ত তাহাদের উচিত শিক্ষকতার মতো মহান পেশা ত্যাগ করিয়া অন্য পেশা গ্রহণ করা।

আমরা শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সদয় দৃষ্টি বিষয়টির দিকে আকর্ষণ করিতে চাই। বিদ্যালয়ে সন্তানকে পাঠাইয়া অভিভাবকরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্ভাব্য নিষ্ঠুরতার ভয়ে আতংকিত থাকিলে সংশ্লিষ্ট স্কুলের ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মর্যাদা বৃদ্ধি হয় না। শারীরিক শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সীমা লংঘন না করিতে আমরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি আহ্বান জানাই। স্কুল কর্তৃপক্ষগুলিকে আমরা অনুরোধ করি, এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বলিব, স্কুলগুলিকে শিক্ষার্থীদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা হয় কি-না তাহা তদারক করিয়া যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে।

কোমলমতি শিশু-শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে আমাদের সবচাইতে বেশী সচেতন থাকিতে হইবে। শিশুদের শারীরিক শাস্তি প্রদানের প্রথা উন্নত বিশ্ব হইতে তো সেই কবেই উঠিয়া গিয়াছে। কোন কোন উন্নত দেশে শিশুদের শারীরিক শাস্তি দিলে এমনকি সংশ্লিষ্ট পিতা-মাতার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণের নিয়ম আছে। উন্নত বিশ্বে এমনকি শিশু-শিক্ষার্থীদের উপর হইতে পড়াশোনার ভার লাঘব করিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে এবং হইতেছে। সিঙ্গাপুরের কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। গবেষকরা দেখিয়াছেন যে, অত্যধিক পড়াশোনার চাপে পড়িয়া শিশু-শিক্ষার্থীরা সৃষ্টিশীল চিন্তা-ভাবনা করার সময় পায় না। আর আমাদের দেশে শিশুদের উপর পড়াশোনার বোঝা চাপাইয়া দিয়াই আমরা ক্ষান্ত হই না, পড়াশোনার জন্য তাহাদের উপর অমানবিক শাস্তির বোঝাও চাপাইয়া দেই।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইল মানুষ গড়ার স্থান। শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ও অপরিসীম গুরুত্বের কথা আমরা অতি অবশ্যই অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একটি ভীতিকর স্থানে পরিণত করা যাহাতে না হয় সেইদিকে আমাদের সকলকে খেয়াল রাখিতে হইবে। তাহা না হইলে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়া হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বরং এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত যাহাতে শিক্ষার্থীরা সেখানে থাকিতেই বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে পারে। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে খেয়াল-খুশিমতো চলিতে দিতে হইবে। আসলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকদের ভারসাম্যপূর্ণ আচরণই সর্বোচ্চ ফল দিতে পারে। শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনে পরিমিত মাত্রায় শাসন করিবেন, আবার ভালও বাসিবেন। এই ভালোবাসার [illegible]